ঘাট বন্ধ। পারাপার বন্ধ। বন্ধ মানুষের রুজি-রোজগার। জীবনের কেমন পালাবদল হয় বন্ধ ঘাটে? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে যমুনা পারের বন্ধ হয়ে যাওয়া দুই ঘাট আরিচা ও জগন্নাথগঞ্জে গিয়েছিলেন **মাহফুজুর রহমান**

প্রাণহীন আরিচা-জগন্নাথগঞ্জ

সহস্রাধিক শ্রমিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বেকার

পদ্মা নদীর পূর্ব পারের আরিচা এক সময় ছিল ফেরি ও লঞ্চ পারাপারের ব্যস্ততম ও বিখ্যাত ঘাট। অন্যদিকে যমুনার পূর্ব পারে জগন্নাথগঞ্জ বিখ্যাত ছিলো রেল যোগাযোগকেন্দ্রিক স্টিমারের জন্য। ঘাটকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিলো ব্যস্ত জনপদ। বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু চালু হওয়ার পর ঘাট দুটির গুরুত্ব কমে যায়। বর্তমানে ঘাটে পারাপার প্রায় বন্ধ। ঘাটকেন্দ্রিক দীর্ঘদিনের ব্যবসা-বাণিজ্যেও মন্দা নেমেছে। শূন্য ঘাটে জীবনের স্পন্দন নেই।

আরিচা ঘাট : থেমে গেছে প্রাণচাঞ্চল্য

মাত্র বছর ছয় আগেও উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ থেকে রাজধানী ঢাকার প্রধান প্রবেশদ্বার ছিলো আরিচা। রাজধানী ঢাকা থেকে ৮৮ কি.মি দূরবর্তী মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলার আরিচা ছিল দেশের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত ঘাট। প্রতিদিন হাজার হাজার বাস-ট্রাকে করে লাখ লাখ যাত্রী ও মালামাল পারাপার হতো দক্ষিণবঙ্গগামী আরিচা-দৌলতদিয়া এবং উত্তরবঙ্গগামী আরিচা-নগরবাড়ী রুটে। যাত্রী এবং ঘাটকেন্দ্রিক ব্যবসায়ীদের আনাগোনায় দিন-রাতের ২৪ ঘন্টাই জেগে থাকতো আরিচা। ঘাটকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিলো হাজার হাজার মানুষের জীবিকা। ছিল হকার, হোটেল, বোর্ডিং, গাড়ি সার্ভিসিং, ঠেলা যোগানদার- থেকে হরেক রকম ব্যবসা। আর ছিলো বিখ্যাত আরিচার যানজট। জ্যামে আটকে ঈদে বাড়িমুখী মানুষের আরিচাতেই ঈদের নামাজ পড়ার নজিরও আছে। ঘাটে অপেক্ষমাণ এই যাত্রীদের বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে সারা দেশ থেকে আরিচায় এসে ব্যবসা গেড়েছিলেন বিভিন্ন পেশার মানুষ।

'৯৮-এর ২৩ জুন বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু চালু হওয়ার পর থেকেই পাল্টে যেতে থাকে আরিচা ঘাটের চিত্র। সময় বাঁচাতে উত্তরবঙ্গের গাড়িগুলোর শতকরা ৯০ ভাগ যমুনা সেতু ব্যবহার করায় আরিচা ঘাটের ব্যস্ততা অর্ধেক কমে যায়। স্থিমিত হয়ে আসে ঘাটের প্রাণস্পন্দন। যাত্রী আনাগোনা হ্রাস হয়ে যাওয়ায় কমে যায় ব্যবসায়ী ও শ্রমিকের সংখ্যা এবং তাদের আয়। নাব্যতা সংকটের কারণে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০২ সালে আরিচা থেকে ফেরি ও লঞ্চঘাট পাটুরিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। পুরোপুরি থেমে যায় আরিচার প্রাণচাঞ্চল্য।

আরিচা ঘাটে এখন এক-আধঘন্টা পর পর একটি করে লঞ্চ ছেড়ে যায় দৌলতদিয়া ও নগরবাড়ীর উদ্দেশে। অথচ যমুনা সেতু উদ্বোধনের আগে ৫-১০ মিনিট পরপরই একসঙ্গে ৫-৬টি করে লঞ্চ যাত্রী বোঝাই করে ছেড়ে যেতে। এখনকার লঞ্চগুলোতে যাত্রীই হয় না। কারণ ভালো লঞ্চগুলো সব পাটুরিয়া থেকে ছাড়ে। বিআরটিসি এবং যাত্রীসেবা পরিবহনের সীমিতসংখ্যক বাস ছাড়া ঢাকা থেকে আর কোনো বাসও ডাকা-আরিচা রুটে চলাচল করে না। নেহাত বাধ্য না হলে কেউ আরিচা লঞ্চঘাট ব্যবহার করে না। পন্টুনগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে পাটুরিয়ায়।

আরিচা ঘাট থেকে বর্তমানে ইঞ্জিনচালিত দেশী নৌকা চলাচল করে আরিচা-কাজীরহাট রুটে। বিআইডব্লুটিএ'র ফেরি টার্মিনাল গাড়িশূন্য, ফাঁকা পড়ে আছে। পুরনো ফেরিঘাটে ভারত এবং দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ঢাকা-চট্টগ্রামের উদ্দেশে নৌপথে আসা গরু নামানো হয়। আরিচা ঘাট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বিআইডব্লুটিএ'র অফিস এখনো আরিচাতেই আছে।

আরিচা ঘাট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যে এর বিশাল বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েছে। রমরমা ব্যবসাগুলোতেও নেমেছে ধস। কিছু ব্যবসা একেবারেই বন্ধ। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ডানপাশে গড়ে উঠেছিল গাড়ির প্রায় ৫০টি ব্যাটারি সার্ভিসিংয়ের দোকান। এর সবগুলো বন্ধ হয়ে গেছে।

ব্যাটারি সার্ভিসিংয়ের দোকান রূপান্তরিত হয়েছে ভিসিডি দোকানে। ফেরিঘাটে ফেরিতে গাড়ি ওঠা-নামায় ঠেলা বা জোগানদারের কাজ করতো ২০০ শ্রমিক। ফেরি না থাকায় এ পেশার অস্তিত্ব নেই। ঘাটে আগত ড্রাইভার-হেলপারদের কাপড় পরিষ্কার করার জন্য প্রায় চল্লিশজন ধোপানী ছিলো। খদ্দের না থাকায় এ পেশাও বন্ধ। ঘাটে ৫০০ হকার ছিলো। আজ আছে মাত্র পাঁচজন। আবাসিক হোটেল বা বোর্ডিং ছিলো ২৫টি। বিখ্যাত ছিলো মোহাম্মদীয়া, ইসলামিয়া, একতা, ভাগ্যলক্ষ্মী। বোর্ডিংগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। যে দু-একটি চালু আছে তাতে বোর্ডার হয় না। সেগুলোতে অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ আছে। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত মোহাম্মদীয়া বোর্ডিংয়ের মালিক খলিলুর রহমান চৌধুরী জানান, লোক হয় না, তাই বোর্ডিং বন্ধ। অথচ ঘাট চালু থাকাকালে এই বোর্ডিংয়ের সিট ব্ল্যাকে বিক্রি হতো। ফুরফুরার পীর, জৈনপুরী পীর, মওলানা ভাসানীসহ বাংলাদেশের অনেক মন্ত্রী-সচিব সপরিবারে মোহাম্মদীয়া বোর্ডিংয়ে এসেছেন।' বন্ধ হয়ে যাওয়া বোর্ডিংয়ে গড়ে উঠেছে ভাঙা পণ্য সামগ্রীর দোকান।

লঞ্চঘাটের দিকে যে কয়টি ছোট ছোট হোটেল আছে তার একটির মালিক কার্ত্তিক কমল বলেন, 'আরিচার মানুষ সুখে নাই।'

আরিচা ঘাটে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত এত লোকজন গেলো কোথায়? ঘাট বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর অধিকাংশই নিজ নিজ এলাকায় চলে গেছে। কিছুসংখ্যক পাটুরিয়া ঘাটে আছে। স্থানীয়দের অনেকেই ব্যবসা গুটিয়ে কৃষি বা অন্যান্য পেশায় চলে গেছে। বেকার শ্রমজীবীরা কৃষি শ্রম বা রিকশা-ভ্যান চালনার মতো পেশায় নিযুক্ত হয়েছে।

ঘাট বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর প্রচুরসংখ্যক মানুষ বেকার হয়ে পড়েছে। বেড়ে গেছে চুরি, নেশা, অপরাধ, অসামাজিক কার্যকলাপ।

ফেরি টার্মিনাল এলাকায় পাঁচ-ছয়জন বিক্রেতা হেরোইন, ফেনসিডিল, গাঁজা ও মদ বিক্রি করে। ফেরিঘাটে আগত গরু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কমিশনের নামে চাঁদাবাজি করা হয়। ফেরিঘাট ও টার্মিনাল এলাকার এসব কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করে স্থানীয় প্রভাবশালী খন্দকার পরিবারের চার সদস্য এবং এদের আত্মীয় সাবেক উপজেলা ছাত্রদল সভাপতি। এদের নামে শিবালয় এবং নদীর অপর পাড়ে রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ থানায় মামলা আছে। শিবালয় থানার মূল গেটের উল্টোদিকে ১০০ গজের ভেতরেই মদ বিক্রি হয়। মদ বিক্রেতা সাদেক একাধিকবার জেল খাটলেও স্থানীয় থানা প্রশাসনকে ম্যানেজ করেই এখনো ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

জগন্নাথগঞ্জ ঘাট : ভালো নেই ওরা

রেলপথ স্থাপনের পর যমুনা নদীর পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ের রেলপথের সংযোগ রক্ষার জন্য পূর্ব পাড়ের জগন্নাথগঞ্জ ঘাট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই রুটে যাতায়াতকারী রেলযাত্রী ও মালামাল পরিবহনের জন্য জগন্নাথগঞ্জ-

সিরাজগঞ্জ ঘাটের মধ্যে স্টিমার চলাচল করতো। রেলপথে জগন্নাথগঞ্জ ঘাট দিয়ে দর্শনা হয়ে কলকাতা পর্যন্ত যাতায়াত করা যেতো। তাই শুধু এ দেশেরই নয়, পশ্চিমবঙ্গেরও বিপুলসংখ্যক যাত্রীর পদচারণায় মুখর থাকতো জগন্নাথগঞ্জ ঘাট। ভারত বিভক্তির পরও জগন্নাথগঞ্জ ঘাটের গুরুত্ব কমেনি। দিন-রাত জেগে থাকতো ঘাট। ইলিশ মাছ এই ঘাট দিয়েই রেলপথে সারা দেশে সরবরাহ করা হতো। ঘাট বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে এই পথে রাজশাহী-চট্টগ্রাম লোকাল ট্রেন এবং ঢাকা-খুলনা ও ঢাকা-রাজশাহী আন্তঃনগর ট্রেন ছিলো। আন্তঃনগর ট্রেনদুটির নাম ছিলো যমুনা ও পদ্মা। পদ্মা এখন বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু হয়ে ঢাকা-রাজশাহী রুটে চলাচল করে। এই ট্রেনগুলোর পূর্ব পাড়ের যাত্রীদের পশ্চিম পাড়ের ট্রেন ধরিয়ে দিতে জগন্নাথগঞ্জঘাট-সিরাজগঞ্জ ঘাটের মধ্যে শেরেবাংলা, সোনারগাঁ এবং সোহরাওয়ার্দী নামে তিনটি স্টিমার দৈনিক মোট ছয়বার যাতায়াত করতো। এই স্টিমার ঘাটকে কেন্দ্র করে অজপাড়াগাঁ জগন্নাথগঞ্জে গড়ে উঠেছিলো জমজমাট বাজার। হোটেল, মুদি দোকানের পাশাপাশি গড়ে উঠেছিলো চাল, ডাল, চিনি লবণ, তেলের আড়ত। কুলি, হকারদের ছিলো সরব উপস্থিতি। স্বাধীনতার পর থেকে যমুনার নাব্যতা হ্রাস পেতে থাকায় প্রতি বছর শুষ্ক মৌসুমে স্টিমার চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। ১৯৯৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর এ ঘাট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১২ জুন '৯৬-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরপরই ২৫ জুন থেকে পুনরায় জগন্নাথগঞ্জ ঘাট হতে স্টিমার চালু করা হয়। মাত্র ছয় মাস স্টিমার চালু থাকার পর ৭ ডিসেম্বর '৯৬-এ ঘাটের মালিক রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ নাব্যতা হ্রাসের কারণ দেখিয়ে স্টিমার চলাচল বন্ধ করে দেয়। একটি বিকল্প লঞ্চ সার্ভিসের ব্যবস্থা করে। ১৯৯৮ সালে বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু চালু হওয়ার পর আন্তঃনগর পদ্মা ট্রেনের পশ্চিম পাড়ের ট্রেনটি রাজশাহী হতে সিরাজগঞ্জ ঘাটে না এসে যমুনা সেতু হয়ে সেতুর পূর্ব পাড়ের স্টেশন পর্যন্ত চলে আসে। ফলে যাত্রীদের কাছে জগন্নাথগঞ্জ ঘাটের যেটুকু প্রয়োজন ছিলো সেটুকুও শেষ হয়ে যায়। লঞ্চ চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়। মৃত্যু ঘটে প্রাণচঞ্চল ঘাটের। অর্ধেকেরও বেশি ব্যবসায়ী এ সময় ব্যবসা গুটিয়ে চলে যান। কমে যায় হকার, কুলির সংখ্যা। বর্তমানে জগন্নাথগঞ্জ ঘাট হতে প্রতিদিন সকাল ৬.৩০-এ একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকা সিরাজগঞ্জের উদ্দেশে ছেড়ে যায়। কিন্তু রেলপথের সংযোগমূলক ঘাট হিসেবে এর ব্যবহার একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। ঘাটের অবকাঠামো ও মালামাল রেল কর্তৃপক্ষ বাহাদুরাবাদ ঘাটে সরিয়ে নিয়েছে। ঘাট রেলস্টেশনে এখন একটিমাত্র ট্রেন ২৫৩ আপ এবং ২৫৪ ডাউন নামে জগন্নাথগঞ্জ ঘাট ময়মনসিংহ জগন্নাথগঞ্জ ঘাট রুটে দিনে মোট চারবার আসা যাওয়া হয়। কিন্তু কোনো টাইম টেবিল নেই। সকালের ট্রেন বিকালে আসাটা নিয়মে পরিণত হয়েছে। অপর পাড়ের কোনো ট্রেনের সঙ্গে এর সংযোগ নেই।

ঘাট বন্ধ হলেও পাশেই পুরাতন ঘাটের জেটি ঘাট থেকে তারাকান্দি যমুনা সার কারখানার টন টন সার ট্রলারে করে প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন স্থানে যাচ্ছে। স্থানীয়দের অভিমত, স্টিমার বন্ধ হওয়ার পর এই ধরনের ট্রলার চলাচলের মাধ্যম অন্তত মালামাল পরিবহনের জন্য হলেও ঘাট সচল রাখা সম্ভব হতো। সে ক্ষেত্রে এপার-ওপার ট্রেনের মধ্যে টাইম টেবিল মেনে সংযোগ রক্ষা নিশ্চিত করলেই হতো। ফাঁকা ঘাটে চলছে জুয়া খেলা। ঘাটসংলগ্ন কাওয়ামারা গ্রামে চলে ফেনসিডিলের খুচরা ও পাইকারী ব্যবসা। ভারত থেকে উত্তরবঙ্গ হয়ে নদীপথে ফেনসিডিল চলে আসে জগন্নাথগঞ্জে। এরপর নদী তীরবর্তী কাওয়ামারা গ্রামের ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় নিরাপদে। পার্শ্ববর্তী ধনবাড়ি, মধুপুর, জামালপুর, গোপালপুর, মুক্তাগাছা, ময়নমসিংহ, ঘাটাইল, ভুয়াপুর উপজেলায় যত ফেনসিডিল লাগে তার চালান যায় এই জগন্নাথগঞ্জের কাওয়ামারা থেকে। প্রতিদিন শত শত মানুষ মোটরসাইকেল ও রিকশা-ভ্যানে করে এখানে আসে ফেনসিডিল খেতে।

যমুনায় স্টিমার চলার মতো পানি না থাকলেও ঘাটের অনেকটুকুই ভেঙে নদীগর্ভে চলে গেছে। ভাঙা ঘাট কালের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দেশের ব্যস্ততম আরিচা ও জগন্নাথগঞ্জ ঘাট বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ক্ষতিগ্রস্ত বিপুলসংখ্যক ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবীদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারি-বেসরকারি কোনো উদ্যোগই নেয়া হয়নি। ঘাটের পরিত্যক্ত সম্পত্তি উৎপাদনশীল কোনো কাজে লাগানো হচ্ছে না। হাজার হাজার মানুষের দীর্ঘদিনের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে ঘাট বন্ধ করার আগেই বিকল্প সরকারি পুনর্বাসন উদ্যোগ নেয়া জরুরি ছিলো। দেরিতে হলেও এ ব্যাপারে সরকারের এখনই এগিয়ে আসা উচিত বলে স্থানীয় সুধীমহল মনে করেন।